যুগান্তর

ছাত্র বিক্ষোভের অরাজনৈতিক চরিত্র

প্রকাশ : ২২ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বদরুদ্দীন উমর

বিক্ষোভ। প্রতীকী ছবি

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে এ অঞ্চলে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস গৌরবজনক। ব্রিটিশ আমলে মধ্য শ্রেণির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এ ধরনের দল এবং রাজনীতির গুরুত্ব ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকা যখন থাকে তখন ছাত্র রাজনীতি থাকলেও এবং তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হলেও তার প্রাধান্য থাকে না। ছাত্র রাজনীতির সেই অবস্থাই ছিল ব্রিটিশ ভারতে। অবশ্য সে সময় ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র সর্বাংশে রাজনৈতিক ছিল, এটাই লক্ষ করার মতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের দ্বারা সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ) নেতাদের বিচার হয়েছিল। এই আর্মির নেতা হিসেবে যখন রশীদ আলীর শাস্তি ঘোষণা করা হয় তখন কলকাতায় তার বিরুদ্ধে যে বিশাল ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তা বিখ্যাত।

সেটাই ছিল সে যুগের ছাত্র রাজনীতির সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া ছাত্ররা সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার। সেই ভিত্তিতেই তারা রাজনীতি করত।

পাকিস্তানি আমলের ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে সব থেকে গৌরবজনক ছিল ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে একথা বলা দরকার যে, ছাত্ররা যে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল তার চরিত্র ছিল দেশপ্রেমিক ও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

সেই আন্দোলনের সঙ্গে শুধু মধ্য শ্রেণি নয়, শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থও জড়িত ছিল। এ কারণেই ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র নিহত হওয়ার পর সারা পূর্ব বাংলায় গণঅভ্যুত্থানতুল্য এক আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৬২ সালে ছাত্ররা আইয়ুব খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আন্দোলন করেছিল।

সে আন্দোলন শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে হলেও তা ছিল প্রবলভঅবে সরকারবিরোধী। সেই হিসেবে তার রাজনৈতিক চরিত্র ছিল স্পষ্ট। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র আন্দোলন ছিল ষোলআনা রাজনৈতিক। তারা সে সময় সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্যাপক ও শক্তিশালীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক দলগুলো যখন যথাযথভাবে এগিয়ে আসছিল না, তারা আপস মনোভাব নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল, তখন ছাত্ররা নেমেছিল এক আপসহীন রাজনৈতিক সংগ্রামে। তারা তৈরি করেছিল ১১ দফা কর্মসূচি এবং তার ভিত্তিতেই তারা আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। ১১ দফা ছিল পুরোপুরি এক রাজনৈতিক কর্মসূচি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ইয়াহিয়ার তৎকালীন সামরিক সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তার বিরুদ্ধে ছাত্ররা শক্তিশালীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এমনকি তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও অবস্থানের ওপর বড় রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ছাত্ররা দলে দলে পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এক হিসেবে বলা চলে, সেটাই ছিল এ অঞ্চলে ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসের শেষ অধ্যায়।

কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সেই সঙ্গে প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন বলে আর কিছু থাকেনি। এদিক দিয়ে বলা চলে, বাংলাদেশ-উত্তর সত্তরের দশক ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনের এক অন্ধকার সময়।

১৯৮০-এর দশকে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। সে আন্দোলনে ছাত্ররা বিশাল আকারে আন্দোলন না করলেও সেই আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের আন্দোলনের চরিত্রও ছিল রাজনৈতিক।

ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আশির দশকের ছাত্র আন্দোলন ছিল বাংলাদেশে ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকার শেষ অধ্যায়। তারপর ১৯৯১ সালে দেশে নির্বাচিত 'গণতান্ত্রিক' সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ঘটেছিল ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমাপ্তি। এরপর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংগঠন ও তৎপরতায় কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা আর থাকেনি, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চরিত্র তো দূরের কথা।

এই শাসকশ্রেণির দুই প্রধান দলের দ্বারা ছাত্র সংগঠনকে পরিণত করা হয়েছিল তাদের ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীতে এবং তাদেরকে আচ্ছন্ন করা হয়েছিল দুর্নীতিতে। ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে এরপর ছাত্র সংসদের আর কোনো নির্বাচন হয়নি। তার জায়গায় শুরু হয়েছিল হল দখলের রাজনীতি।

১৯৯১ সালে বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল হল দখল করেছিল। তারপর ১৯৯৬ সালে হল দখল করেছিল ছাত্রলীগ। এভাবেই বাংলাদেশে ছাত্রসংগঠনের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রগতিশীলতার লেশমাত্র আর থাকেনি। এ পরিস্থিতির ভয়ংকর অবনতি ঘটতে শুরু করে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে।

ছাত্রলীগ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হয় একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, সন্ত্রাসী এবং সরকারি দলের ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীতে। আওয়ামী লীগ ও তাদের সরকার নিজেদের অজ্ঞাবাহী লোককে উপাচার্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নানা ধরনের অপরাধমূলক তৎপরতায় সহায়তা করে। এর প্রভাব পড়ে সারা দেশের ছাত্রসমাজের ওপর।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছাত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ছাত্রসমাজে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অনেক খুনখারাবি করে। অনেক ছাত্র তাদের হাতে নিহত হয়। অছাত্রেরাও তাদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এর মধ্যে সব থেকে ভয়ংকর ও উল্লেখযোগ্য হল- ঢাকার সদরঘাটে বিশ্বজিৎ নামে এক নিরীহ যুবককে টেলিভিশন ক্যামেরা ও জনগণের সামনে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা।

এসব কাণ্ড করা ছাত্রলীগের নেতাদের তেমন কোনো শাস্তি হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তি হলেও অপরাধের তুলনায় তাদের তেমন শাস্তি হয়নি। অপরাধের কোনো বিচার না হওয়ায় তারা এক দানব চরিত্র পরিগ্রহ করে।

অপরাধ করলে শাস্তি হবে না, এই অলিখিত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ব্যাপকভাবে সারা দেশের ছাত্র মহলে সৃষ্টি করে এক অপরাধের রাজত্ব। এ পরিস্থিতিতেই সম্প্রতি ঘটেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) আবরার ফাহাদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড।

এক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় হল, যারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং এ সময় চরম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে, তারা বুয়েটে এসে ছাত্রলীগের সদস্য হওয়ার আগে নিজ নিজ এলাকায় ভালো ছাত্র ও মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। এই হত্যাকারীদের মধ্যে দু'জনের পিতা রিকশা ও রিকশাভ্যান চালক।

তারা মেধাবী ছাত্র হিসেবে নিজের এলাকায় পরিচিত ছিল। তারা কোনো দিন কোনো খারাপ বা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তারা অপরাধীতে পরিণত হয়েছে বুয়েটে এসে, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে। এই কাঠামোর চরিত্র এমন যে এর মধ্যে কারও ভালো থাকার উপায় নেই।

কোনো সমাজ বা সংগঠন যদি ভালো ও প্রগতিশীল হয়, তাহলে সেখানে এসে একজন খারাপ লোকও ভালো লোকে পরিণত হয়। আবার কোনো সমাজ বা সংগঠন যদি খারাপ হয়, তাহলে তার মধ্যে একজন ভালো লোকও খারাপ হয়ে যায়। ছাত্রলীগ এমন একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে ভালো ছাত্র ও ভালো মানুষ খারাপ ও নষ্ট হয়ে যায়, যেমন দেখা গেছে বুয়েটে ছাত্র হত্যাকারী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের কয়েকজনকে।

ছাত্রলীগ বর্তমানে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে এর কোনো রাজনৈতিক চরিত্র আর নেই। একথা আগেই বলা হয়েছে। তারা পরিণত হয়েছে একটি অরাজনৈতিক ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীতে। তাদের কাজ দাঁড়িয়েছে বিদ্যমান শাসক দলের খেদমতে নিজেদেরকে হাজির রেখে বাহিনীকে চারদিকে চুরি-দুর্নীতি-সন্ত্রাস করা।

কিন্তু শুধু ছাত্রলীগেরই যে কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই তা নয়, যে ছাত্ররা এই হত্যাকাণ্ডের পর ব্যাপকভাবে বড় আকারে ঢাকা এবং দেশের সর্বত্র রাস্তায় নেমেছে, নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিনের পর দিন বিক্ষোভ করেছে এবং করছে, তাদেরও এই বিক্ষোভের প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই।

এই বিক্ষোভকারীরা তাদের আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট করেছে শুধু বুয়েট প্রশাসনকে। কিন্তু যে প্রশাসনকে সরকার সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাদের নির্দেশে তারা কাজ করে, তার বিরুদ্ধে এই ছাত্র বিক্ষোভের কর্মসূচিতে কিছু নেই। ছাত্রলীগ সর্বত্র যা করছে সেটা প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সরকারি কর্তাব্যক্তিরাই করছে।

তারা এসবকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে ঠিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ ধরনের কোনো ব্যাপার আগে ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে মোনায়েম খানের সময় তাদের ছাত্রসংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র ছিল বিভীষিকার মতো।

সেটা হতে পারত না যদি সরকার ছাত্রসংগঠনের পেছনে না থাকত। এখন স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, এটা মোনায়েম খানের সরকার আমলের থেকেও ভয়ংকর এবং এর শেকড় ছাত্রসমাজের গভীর দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

যাই হোক, বুয়েট হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভের চরিত্র যে অরাজনৈতিক এবং এটা যে শুধু বুয়েট প্রশাসনের বিরুদ্ধে- এ নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, সবরকম ছাত্র বিক্ষোভের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্র নিহত হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে বেশ বড় ও তীব্র বিক্ষোভ হয়েছে। চাকরিতে কোটা নির্ধারণের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র বেশ কয়েকদিন ধরে একটানা বিক্ষোভ হয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্ররা দাবি-দাওয়াও পেশ করেছে। কিন্তু তার কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই।

নানা ধরনের নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এসব বিক্ষোভ দেখা গেছে বিস্ফোরণের মতো। বিস্ফোরণ যেমন অল্পকাল স্থায়ী, তেমনি এই সব বিক্ষোভও হয়েছে স্বল্পস্থায়ী। এসব বিক্ষোভের কোনো ধারাবাহিকতা নেই।

এই বিক্ষোভ সরকার ও শাসক শ্রেণির নানা শোষণ-নির্যাতন, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু, গুম, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাট ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদের, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়।

এই লক্ষ্যের কোনো চিহ্নমাত্র এসব বিক্ষোভের মধ্যে নেই, যদিও এগুলোর তাৎপর্যকেও শোষক-শাসক শ্রেণি ও তাদের সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

যেসব ছাত্র বিক্ষোভ সম্প্রতি হয়েছে, যার উল্লেখ উপরে করা হল, সেগুলোকে ঠিক ছাত্র আন্দোলন বলা যায় না। প্রতিবাদ হিসেবে এগুলো উল্লেখযোগ্য এবং ভবিষ্যতে নতুনভাবে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে এদের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় নেই।

এর মূল কারণ হল, শুধু ছাত্র নয়, সারা দেশের জনগণের মধ্যেও এখন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব। এই অভাব হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি, অকারণেও নয়। এটা শাসক শ্রেণির দুষ্ট শাসনেরই পরিণতি।

তারা দেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ১৯৭২ সাল থেকেই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাতে সামগ্রিকভাবে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা স্তিমিত হয়ে অনেকাংশে নিঃশেষ হয়েছে।

এটাই বড় কারণ, যে জন্য এখন শুধু ছাত্রসংগঠন ও ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যেই রাজনীতির অভাব রয়েছে তাই নয়; গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের এবং অন্যান্য সংগঠনেরও অস্তিত্বহীনতার কারণও এর মধ্যেই নিহিত।

২০.১০.২০১৯

বদরুদ্দীন উমর : সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।